বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ 11 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

063

ডিগ্রী সার্টিফিকেটে আগুন

অপ্রতিম

৫০ জন তারতীয় যুবক আশপাশ থেকে লোক ডেকে লোকজনের সামনে তাদের ডিগ্রী সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলে। এরপর নয়াদিল্লীর যন্তর-মন্তর রোড দিয়ে সরকার বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হয় এবং একটি মান-মন্দিরের কাছে জুতা পালিশ করতে শুরু করে। অন্যের নয়, নিজেদের একজন আর একজনের। এদের বক্তব্য হলো, যে জিনিসে কোন কাজ হয় না এর বোঝা বহন করে কী লাভ! স্বর্তব্য যে, প্রায় দু'বছর হয় এরা ডিগ্রী পাস করেছে। এরপর যেন-তেন একটা চাকরির খোঁজে এখানে- সেখানে ধর্না দেয়। কিন্তু সর্বত্র 'নো ভ্যাকান্সী'র হতাশা ভরা প্লাকার্ড। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে এরা সার্টিফিকেটে আগুনদেয়।

এ আগুন দেয়ার মধ্যে কোন আবেগ নেই। আছে নিষ্ঠুর বাস্তবের কষাঘাত। কারণ, প্রতিটি কাজের পেছনেই একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে। লেখাপড়াও এর ব্যতিক্রম নয়। লেখাপড়ার একটা উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ। নিজেকে ও বিশ্বকে জানা। আর একটা উদ্দেশ্য নিজেকে জীবন যুদ্ধে জয়ী করে তোলার উপযোগী করা। জীবনে বাধা আছে, আশাও আছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভালভাবে বাঁচার আশা। এ আশা পূর্ণ করার জন্য কর্মসংস্থান প্রয়োজন। কিছু আছে যাদের উপস্থিত মত কাজ না পেলেও চলে। অন্ততঃ উপোস করতে হয় না। সহ্য করতে হয় না মা-বাবা, ভাই-বোনের মলিন মুখের দাহ। আবার কিছু আছে যাদের এমনই একটা কাজ চাই, না হলে শুধু নিজের জীবন বিড়ম্বিত হয় না, মা-বাবারও আশাভঙ্গ ঘটে। অনেক মা-বাবা আছেন যারা কষ্ট করে, থালা-ঘটি-বাটি বিক্রি করে পুত্র-কন্যাকে লেখাপড়া করান তাদের আশা থাকে ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেষ করে কাজ করবে। ভদ্র সমাজের এক কোণে ঠাঁই পাবে এবং সংসারের হাল ধরবে। এ অবস্থায় বছরের পর বছর কেটে যাবার পরও যখন কাজ হয় না তখন হতাশার জন্ম হয়। কেউ সার্টিফিকেটে আগুন দিয়ে জুতা পালিশ করে। আবার কেউ বা দুষ্ট চক্রের সাথে ভিড়ে যায়। অন্য আর একটা অংশ হয় ক্ষুদ্র স্বার্থবাদী রাজনীতিক ও বিত্তশালীর লাঠিয়াল। এরা অন্যের মাথা ভাঙ্গে। হাইজ্যাকার হয়। লোকে ছি ছি করে। দাবী জানায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির। হয়তো এর বাইরে কিছু চাওয়ারও থাকে না। কারণ, এদের উপদ্রব অনেক সময় অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর জন্য দায়ী কে? সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন ব্যর্থতা কি এর পেছনে নেই?

সরকারী হিসেব মতে, তারতে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পাঁচ কোটির কিছু কম। বেসরকারী হিসেব মতে সংখ্যাটা অবশ্য অনেক বেশী। প্রায় ১০ কোটির কাছাকাছি। এ হিসেব মেনে নিলে বেকার জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-সপ্তমাংশ। এদের কার ভাগ্যে কখন শিকা ছিঁড়বে কেউ জানে না। বলাবাহুল্য, এ অবস্থা শুধু যে তারতে তা নয়, প্রায় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে বেকার সংখ্যা কত এর সঠিক কোন হিসেব নেই। কেউ বলেন, সাত লাখ। কেউ বলেন, সত্তুর লাখ। সাত কিংবা সত্তুর যা হোক, সংখ্যাটি শিক্ষিত বেকারের। অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বেকার অনেক বেশী। আড়াই-তিন কোটির কম নয়। এ ছাড়াও আছে মৌসুমী বেকার। শেষোক্ত বেকার সংখ্যা চাষীকুলেই বেশী। বছরের সব সময় চাষাবাদ হয় না। এছাড়া বন্যা জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপস্থিত হলে বেকার দিন কাটাতে হয়। এখনো বাংলাদেশে বন্যাজনিত বেকার প্রচুর। বেশ ক'টি জেলা বন্যাকবলিত হয়েছে। মাঠ-ঘাট ভেসে গেছে। নিরাশ্রয় মানুষ আশ্রয়ের সংস্থান করছে। নদীর ভাঙ্গনে ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে হাজার হাজার পরিবার। তেমন কোন সাড়া নেই। অথচ গত বছর ঢাকায় বন্যার সময় সেকি হাঁক-ডাক, দৌড়-ঝাঁপ, কান্না-কাটি। এর কারণ ছিল এই যে, গত বছর বন্যাকবলিত হয় মধ্যবিত্ত 'এলাইড' শ্রেণী। আক্রান্ত হয়েছিল খোদ রাজধানী ঢাকা। এবার তা নয়, এবার বিপর্যস্ত হচ্ছে গাঁয়ে-গঞ্জের মানুষ। এদের জন্য এত কান্না-কাটির সময় কোথায়? তাই বন্যায় বেকার হয়ে পড়া লোকজন কিভাবে দিন কাটাচ্ছে বলার উপায় নেই। অন্য ধরনের বেকারও আছে। সব মিলিয়ে সংখ্যা কারো কারো মতে প্রায় আড়াই-তিন কোটি।

কোন দেশের জন্যই এ অবস্থা সুখের নয়। কারণ, জনশক্তিই একটা দেশের শ্রেণীশক্তি ও সম্পদ। যে দেশ জনসংখ্যার সদ্ব্যবহার করতে যত সক্ষম, সে দেশই তত উন্নতির পথে ধাবমান। জাপান-জার্মানী প্রভৃতি দেশের প্রতি তাকালে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দু'টি দেশই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। শিল্প-কারখানা তথা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। যুদ্ধের পর সেসব দেশের নেতারা জনশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করেন। ফলে অবিশ্বাস্য কম সময়ে দেশ দু'টো আবার উন্নত দেশের তালিকায় উঠে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক্ষেত্রে বেশী অবদান রাখে তরুণের প্রাণ-চাঞ্চল্য, কর্মশক্তি ও মেধা। কিন্তু আমাদের দেশের মত দেশগুলোতে যুবশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে পরীক্ষায় পাস করে। কিছু ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, কিছু বিদেশে চাকরির সুযোগ পেলে বিদেশে যাত্রা করে, কিছু এক শ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যক্তি ও একশ্রেণীর রাজনীতিকের লাঠিয়াল হয়, আবার কিছু পথ হারিয়ে চলে যায় অন্ধকার গহবরে। চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে অতি অল্পই। কারণ, চাকরি আমাদের দেশে সোনার হরিণ। দু'একজন অতি ভাগ্যবান এবং খুঁটির জোর ছাড়া এ কারো কাছে ঘেঁষা দেয় না, ছোঁয়া দেয় না। এ না দেয়ার একটা বড় কারণ শিল্পায়নে শ্লথ গতি। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গত ক'বছরে কাজ বলতে কিছু পুল, কার্লভাট আর রাস্তা তৈরী হয়েছে। কোন কোন সড়ক সেতু যদিও মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ যেমন, ভৈরব ও দৌলতকান্দির মধ্যবর্তী পুরনো ব্রহ্মপুত্র সেতু। খরা মৌসুমেই এর নীচ দিয়ে লঞ্চ যেতে পারে না। বর্ষাকালের তো কথাই নেই। অন্যদিকে সেতু তৈরী করতে গিয়ে নদীতে দিতে হচ্ছে আট-দশটা পিলার। তৈরী হচ্ছে আর এক বিপদ। কারণ, এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়ে পলি পড়া বাড়তে পারে। জাগতে পারে নতুন চর। এর জন্য প্রয়োজন ড্রেজিং কিন্তু সে ব্যবস্থা নেই। আর নেই বলেই অনেকে মনে করেন, হেন সেতু তৈরী করে ভবিষ্যৎ চর পড়ার পথ প্রশস্ত করার চেয়ে ফেরি সার্ভিসের ওপর জোর দেয়া শ্রেয়। বক্তব্যটি কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। আমার আলোচ্য তা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গত ক'বছরে এ ধরনের উন্নতি যত হয়েছে শিল্পায়ন এর সিকিভাগও হয়নি। অথচ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকার কম সুযোগ দিচ্ছেন না। তবু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ঝোঁক ব্যবসা আর এজেন্সির প্রতিই বেশী থেকে যাচ্ছে। টেলিভিশনের প্রতি তাকালে আজকাল দ্বিতীয় যে বিষয়টি বেশী চোখে পড়ে তাহলো গুঁড়া দুধের বিজ্ঞাপন। এ দুধ কোনটা হল্যান্ডের, কোনটা অষ্ট্রেলিয়ার, কোনটা ডেনমার্কের আবার কোনটা নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানী করা হচ্ছে। দুধের এ গুটকির ব্যবসা করে কিছু কিছু লোক কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন। দুবছর আগে বাসের হ্যান্ডেল ধরা ছাড়া যার গতি ছিল না এখন তিনি বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা দামের গাড়ী চালাচ্ছেন। গত বছর দুধ আমদানী করা হয়েছে প্রায় ৪শ' কোটি টাকার। চলতি বছর হয়তো আরও বেশী আমদানী করা হবে। এতে কিছু লোক টাকার কুমীর হবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্পদ বাড়বে না। অথচ বছরে যদি অর্ধেক দুধ আর অর্ধেক গাঁড়ী আনা হতো, তাহলেও সম্পদ বাড়ত। হয়তো একটা সময় আসত যখন আর আমদানীর প্রয়োজন পড়তো না।

কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সে প্রয়াস নেই। আর নেই বলেই শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে কম। বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হচ্ছে না। অন্যদিকে সরকারী চাকরিও বছরের পর বছর যাবৎ বন্ধ। প্রকাশ্যে লোক নিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে বেকার বাড়ছে। বাড়ছে হতাশা। এ হতাশা কি ব্যাপক ও মেধা বিধ্বংসী একটি যুবকের পত্র এর প্রমাণ। যুবকটি লিখেছে, বিএ পাস করেছি তিন বছর। কোথাও কোন কাজ পাচ্ছি না। গরীবের ছেলে, চাষ-বাস করারও উপায় নেই। এদিকে সরকারী চাকরির বয়ঃসীমা পার হয়ে যাচ্ছে। 'দিন দিন জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মা হচ্ছে। ভাবছি আত্মহত্যা করবো কি-না।' প্রশ্ন হচ্ছে, এ হতভাগ্য যুবক যদি আত্মহত্যা নাও করে তবু কি তার জীবনী শক্তি রক্ষা পাবে?

৫০ জন তারতীয় যুবক হেন অবস্থায় পৌঁছেই সার্টিফিকেটে আগুন দিয়েছে কি-না জানি না। তবে জীবনের বিড়ম্বনা এত সুতীব্র হওয়ার পর কিছুই অসম্ভব থাকে না। তাই পথ-ঘাট সাজানো এবং রাজনৈতিক কারণে পুল-কালভার্ট তৈরী না করে উৎপাদনশীল কাজে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যাতে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ব্যবসার স্থলে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগকে প্রাধান্য দেয়। কারণ, ব্যবসা প্রাণ সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করে মাত্র, সম্পদ বাড়ায় না। সম্পদ বাড়ায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে শিল্প। তাই দেশের বেকার জন-শক্তির সদ্ব্যবহার ও সম্পদ বাড়ানোর জন্য এদিকে বেশী নজর দেয়া প্রয়োজন না তাহলে শুধু তারতের ৫০ জন বেকার যুবকই যে ডিগ্রী সার্টিফিকেট পুড়িয়ে দিয়েছে তা নয়; অন্য দেশে অন্যরাও তা করতে পারে। ক্ষোভ ধ্বনিত হতে পারে চারদিকে। কারণ, বেকার জীবনের চেয়ে অভিশাপ আর কিছু নেই।